কল্পনা ও বাস্তবতার সংঘাত

সাজ্জাদ জহির

মানুষের জীবনে এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকে, যা উৎকৃষ্ট অন্তরের অধিকারীদেরকেও ফলপ্রসূ কাজে অংশগ্রহণ এবং আবশ্যক কর্তব্য পালনে বাধা দেয়। এসকল প্রতিবন্ধকে আটকে পড়া মানুষের দিন কেটে যায় নানাবিধ মূলনীতি ও নিজস্ব চিন্তার পরস্পরবিরোধী প্রতিযোগিতার মাঝে।

সভা-সেমিনারের জৌলুশপূর্ণ আলোচনা এবং কাগজের লেখার সৌন্দর্য মানুষ খুব সহজেই অনুভব করে। কিন্তু ব্যক্তি যখনই তাত্ত্বিক আলোচনার গণ্ডি থেকে বের হয়ে প্রয়োগক্ষেত্রে আসে, তখন ধাক্কা খায়। চাকচিক্যময় তত্ত্বকে বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করতে তারা ব্যর্থ হয়। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিন্দিত হয়।

উদাহরণত, যখন কোনো আলিম বিবাহিত ব্যক্তির যিনার হদ নিয়ে শরিয়তের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিকমতের আলোচনা করে বলে, 'যিনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জনসম্মুখে উপস্থিত করে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে।'

এ বাস্তবতার একদিকে রয়েছে তীব্র অনুভূতি এবং অপরদিকে রয়েছে মানুষের ওপর এর প্রভাব। যখন আপনি এই দৃশ্যটি নিয়ে চিন্তা করবেন তখন আগেকার আনন্দের বদলে হৃদয়ে জায়গা করে নিবে সহানুভূতি। অপরাধীর কান্না, অঝোর ধারায় অশ্রুবর্ষণকারী অবস্থায় তার সন্তানকে আটকে রাখার দৃশ্য অস্থির করে তুলবে আপনাকে। সন্দেহ নেই, এ জাতীয় দৃশ্যকে সামনে রেখে যে-কোনো আলেমের পক্ষে শরীয়তের মহত্ব ও হিকমত ফুটিয়ে তোলা কষ্টসাধ্য হবে। উক্ত আলিম নিজেই হয়তো রক্ত দেখে মূর্ছা যাবে। হয়তো রজমকৃত ব্যক্তির মৃতদেহ দেখে মুহতারাম শায়খ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাবেন। কেননা, চমকপ্রদ কল্পনা আর বাস্তবতার মাঝে রয়েছে বিশাল ফারাক।

একইভাবে, মানুষ জিহাদ নিয়ে কথা বলে যেহেতু জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর একটি শব্দ। কিন্তু বাস্তব জিহাদ, জিহাদের প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহ কিন্তু সুখকর নয়। জিহাদ কোনো ঝংকার তোলা বক্তৃতা বা সুন্দর সুন্দর কথার নাম নয়। জিহাদ মানেই গনীমত কিংবা বন্দীলাভ নয়। জিহাদ কোনো অনলবর্ষী বক্তার বক্তৃতাও নয়। জিহাদের মাঝে রয়েছে প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু, বন্ধুর আহত হওয়ার দৃশ্য, মাথার ঠিক ওপর দিয়ে শেল উড়ে যাওয়া, ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলা এবং প্রায়ই কোনো সাহায্যকারী না থাকা। অন্যভাবে বললে, জিহাদের মাঝে রয়েছে সর্বপ্রকারের ভয়ংকর সব কষ্ট। জিহাদের ময়দানে সৈন্যসমাবেশ ঘটে। মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে। এ তাকে মারে, সে তাকে ধরে, ও ঝগড়া করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সর্বোপরি জিহাদ হলো গণআন্দোলন। স্বাভাবিকভাবেই তাই এর মাঝেও রয়েছে ভুলভ্রান্তি, ইজতিহাদ, অপব্যাখ্যা ইত্যাদি। কখনো বিষয়গুলো সুখকর হয়, কখনো হয় না। এখানেও রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতা। সুখকর কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে বিরাট ব্যাবধান।

আমরা যদি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মানুষের কাল্পনিক ধ্যানধারণার দিকে তাকাই তাহলে দেখব, অধিকাংশ মানুষ স্বপ্নের জগতে বসবাস করছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। তাদের এই স্বপ্নের জগতে রয়েছে মনোরম দৃশ্যাবলী, অভিবাদন জানানোর জন্য গালিচা, মনোমুগ্ধকর রঙিন সব দৃশ্যকল্প আর সর্বদা বৃষ্টি বর্ষণকারী সুবিশাল এক আকাশ। যেখানে শত্রুরা যেন সদাসর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে এই ভেবে যে, যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতাগণ সার্বক্ষণিক আমাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করে। তারা ভাবতে ভালোবাসে যে, ইসলামি রাষ্ট্রে দারিদ্র্য আর অসুস্থতা থাকবে না। তারা যা চাইবে তার সবই তাদের সামনেই থাকবে।

কিন্তু যদি আমরা নবি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাষ্ট্রের দিকে তাকাই তাহলে এমনটা দেখতে পাব কি?

আমরা দেখতে পাব যে, মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রে সাহাবাদের যন্ত্রণা-দুর্ভোগ অনেক বেশি ছিল। খন্দকের যুদ্ধের ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন তাঁদের হতে হয়েছিল। মুনাফিকদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা আর ইহুদিদের কূটচাল তাঁদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখত।

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اِذۡ جَآءُوۡكُمۡ مِّنۡ فَوۡقِكُمۡ وَ مِنۡ اَسۡفَلَ مِنۡكُمۡ وَ اِذۡ زَاغَتِ الۡاَبۡصَارُ وَ بَلَغَتِ الۡقُلُوۡبُ الۡحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوۡنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوۡنَا

هُنَالِكَ ابۡتُلِىَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَ زُلۡزِلُوۡا زِلۡزَالًا شَدِيۡدًا

> “যখন তারা তোমাদের কাছে ওপর-নিচ থেকে আসছিল তখন তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হচ্ছিল। আর তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে বিরূপ ধারণা করছিলে। তখন মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল।” (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:১০-১১)

এই দৃশ্যপটকে বর্তমানের কল্পিত ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে মিলিয়ে দেখুন। তারা এমন রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দেন, যাতে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না; অস্তিত্ব থাকবে না কোনো ভয় এবং ভীতির। প্রত্যেক মানুষের জন্য থাকবে বাসস্থান, প্রতিটি পেটের জন্য থাকবে পর্যাপ্ত খাবার। আর মানুষ তাদের এই স্বপ্ন বা প্রতিশ্রুত রাষ্ট্রের জন্যই বিভিন্ন কর্মসূচী, আন্দোলন বা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এসকল কল্পিত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই মানুষ বিভিন্ন জামাআতের নিকটবর্তী হয়। কেননা তাদের মস্তিষ্কে একথা ঘুরপাক খাচ্ছে যে, আমরা অন্যান্য জামাআতের তুলনায় তাদেরকে অধিকতর দুনিয়াবী সুবিধা দিব।

কিন্তু, খুলাফায়ে রাশিদিনের তিনজনই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ফজরের সময় উলামা-মাশায়েখ, সেনানায়ক ও নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতেই আল্লাহর দুশমন আবু লুলুর হাতে শহীদ হন। রোজাদার অবস্থায় উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কিছু বিদ্রোহীর হাতে নিহত হন। অথচ তিনি ছিলেন রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে। আলী ইবন আবী তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদে দাঁড়িয়ে ফজরের সময় মানুষদের সালাতের জন্য ডাকছিলেন। তার চারপাশে একদল লোকও ছিল। এমতাবস্থায় খারেজী ইবন মুলজিম তরবারী দ্বারা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মাথায় আঘাত হানে। এটা ছিল খেলাফাতে রাশিদার যুগ। আর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তো অনেকেরই জানা আছে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আর আবু মুসলিম খুরাসানির তান্ডবের আলোচনা সবাই জানে। উমাইয়া আর আব্বাসি শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে তারা তলোয়ার ব্যবহার করেছিল।

ইসলামি বিশ্ব নিয়ে অলীক স্বপ্ন দেখা ব্যক্তিরা গোলকধাঁধার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা কল্পনার জগতে বসবাস করছে, যা তাদের পিছিয়ে দিচ্ছে। তাদের কল্পনায় যা আছে, তারা তা বাস্তবায়নে অক্ষম। কেননা, এজাতীয় চিন্তাধারা কাগজ-কলম আর কল্পনাতেই কেবল সীমাবদ্ধ। এজাতীয় চিন্তা-ভাবনা আদৌ ইসলাম নয়। বরং, ইসলাম হলো জীবনসংগ্রামের নাম। যে সংগ্রামের মাঝে মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি, শুদ্ধ-অশুদ্ধ সবই বিদ্যমান। এই সংগ্রামী জীবনের ধারাবাহিকতাই সঠিক বিষয়গুলিকে সহায়তা ও শক্তিশালী করে আর ভুলত্রুটিকে শুধরে দেয়।

ইসলামি বিশ্বে যেমন আদল-ইনসাফ থাকে, তেমনই থাকতে পারে ক্ষুধা-দারিদ্র্যের অমানিশাও। মুসলিমদের মধ্যে সত্যপন্থী যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে মিথ্যাবাদীরাও। ইসলামি সমাজে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ একটা অবস্থান রয়েছে। ইসলাম ভুলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে, সৃষ্টির মাঝে ভুল থাকাকে অনর্থক মনে করে না। ভুলের অস্তিত্ব রয়েছে বলেই আল্লাহ তা’আলা হুদুদ ও শাস্তি নাযিল করেছেন, নাযিল করেছেন আহকাম। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَ لَا تَكُنۡ لِّلۡخَآئِنِيۡنَ خَصِيۡمًا

> “আমি তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন

না।” (সূরা আন-নিসা, ০৪:১০৫)

আল্লাহ তা'আলার অলঙ্ঘনীয় বাণী প্রতিটি মুসলিম, মুওয়াহহিদ ও মুজাহিদ সমাজের জন্য। এই চিরন্তন বাণী কোনো কাফির-মুশরিকের জন্য নয়। ইসলামের ইমাম ও অনুসরণীয় হওয়া সত্ত্বেও ফিতনার সময়ে আলী (রা.) এর সাথে আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর দ্বন্দ্ব হয়েছিল। যদি আমরা বাস্তবতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করি এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তবে এমন বিষয়াদির উপস্থিতি দেখতে পাই যা শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে ছাড়ে। অথচ তা ছিল খাইরুল কুরুন তথা সর্বোত্তম প্রজন্মের সময়ে সংঘটিত।

উদাহরণত,

১) খারেজিদের ফিতনা। চার হাজার খাওয়ারিজ আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করে। আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাদের কাছে প্রস্তাব পাঠান, “এসো আমাদের এবং তোমাদের প্রতিপক্ষ মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রতিহত করি।” তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে তাকফির করে এবং তাঁকে তাওবা করতে বলে। এতেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি। আব্দুল্লাহ্ ইবন খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও উনার গর্ভবতী স্ত্রীকে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়। অতঃপর নাহরাওয়ানের ভূমিতে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যুদ্ধাহত চারশত খারেজী ব্যতীত বাকি সকল খাওয়ারিজকে হত্যা করেন।

২) জামাল যুদ্ধ। যা সংঘটিত হয়েছিল বসরার উপকণ্ঠে। উমর ইবন শাইবার রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল মুসলিমদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। বরং বলা চলে দুই গোত্রের মাঝে (যেমন, আলী রা. পক্ষের মুদার গোত্রীয়রা আয়িশা রা. এর পক্ষের মুদার গোত্রীয়দের বিরুদ্ধে...) । জামাল যুদ্ধ ছিল একই জাতিগোষ্ঠী, দ্বীন ও রীতিনীতির অনুসারীদের মধ্যকার এক যুদ্ধ, ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও যুবায়ের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হোন, যারা ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত।

৩) সিফফিনের যুদ্ধ। সন্ধির প্রতি উৎসাহিত করা সত্ত্বেও এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মাঝে। এই যুদ্ধে নিহত মুসলিমদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, মানুষ বলছিল শামবাসীর (যারা ছিল মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর অধীন) ধ্বংসের পর কে শামের সীমান্তের নিরাপত্তা দিবে? ইরাকবাসীর (যারা ছিল আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর অধীন) ধ্বংসের পর কে ইরাকের সীমান্তের নিরাপত্তা দিবে? নারী-শিশুদেরই বা কী হবে? দুর্বল এক রেওয়ায়েতে এ যুদ্ধে ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ রয়েছে। যাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই এটি একটি বড় যুদ্ধ ছিল।

৪) ইসলাম গ্রহণের পর কিছু লোকের পুনরায় খ্রিস্টধর্মে ফিরে যাওয়া।

এমনকি তারা এই কথা পর্যন্ত বলতে থাকে, “আমরা যে ধর্ম (অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম) ত্যাগ করেছি তা ইসলাম অপেক্ষা উত্তম। অযথা রক্তপাত, মুসাফিরদের ভীতসন্ত্রস্তকরণ এবং ধনসম্পদের লুটপাট থেকে ইসলাম নিরাপত্তা দিতে পারে না।” (তাবারী)

অতঃপর, আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রিদ্দাহর শাস্তিস্বরূপ তাদের সকলকে হত্যা করেন। আরো মনে করিয়ে দিতে চাই, নিশ্চয়ই তিন শহীদ খলিফার কেউই কাফিরের হাতে নিহত হন নি। বরং মুসলিম নামধারী পাপিষ্ঠ বিদআতীদের হাতে নিহত হয়েছেন। উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকারী আবু লু'লু সম্পর্কে কাতাদা রহঃ এর অভিমত হলো–

> “সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও তাকে মুশরিকদের দিকে সম্বোধন করা হয়।”

উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকারী বিদ্রোহীরা মুসলিমই ছিল। যাদের কেউ কেউ পরবর্তীতে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর বাহিনীর সেনানায়কও হয়েছিল। আর, আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকারী ইবন মুলযিম ছিল খারেজী।

বিষয়গুলো এখানেই থেমে থাকেনি। অতঃপর হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর শাহাদাত, আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবাইরের যুদ্ধ, হাররার

ঘটনা ইত্যাদি একের পর এক সংঘটিত হয়। এ তালিকা অনেক লম্বা। আর উত্থান-পতন আর ভালো-মন্দের উঠানামার এই তীব্রতাই মানবজীবনের বাস্তবতা। তাই কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য সংগত নয় কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি না নিয়ে হাল ছেড়ে দেয়া।

মানুষ মনে করে একজন মুসলিমের জীবন জুড়ে থাকবে শুধু রাতের সালাত, দিনের সিয়াম, ক্ষমা, দানশীলতা প্রভৃতি। সর্বোপরি সর্বপ্রকার কল্যাণের সমাবেশ। এমনকি সাধারণ মানুষের কল্পনার ক্যানভাসে থাকে— 'মুসলিম মানেই আল্লাহর ওলী' হওয়ার চিত্র। এমনটা কেবল কল্পনাতেই সম্ভব, বাস্তবে যার কোনো ভিত্তি নেই। এ ব্যাপারে ইবন কুতাইবার 'আল-মাআরিফ' দেখুন।

জেনে রাখুন, ওলী একজন মাটির তৈরী মানুষ। মুজাহিদ একজন একজন মাটির তৈরী মানুষ। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে অতিমানবীয় ও বাস্তবতা বিবর্জিত ধারণা দানকারী চলচ্চিত্র নির্মাণ করা ফেরেশতাদের নিয়ে বানানো ছবি থেকেও অবমাননাকর। তাই এজাতীয় কল্পনাবিলাসী ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমরা বলব যে, তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ছেড়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে মশগুল হয়ে আছে। তাদের এই অতিসংবেদনশীলতা তাদেরকে ভুলভ্রান্তির ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহর অনুগ্রহ, কল্যাণ ও নিয়ামত উপলব্ধি করা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তারা স্বভাবজাত বা ছোটখাটো বিচ্যুতিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এটাও বুঝতে হবে যে, দাওয়াহ ও জিহাদের সমন্বয়ে সুসংগঠিত ইসলামি আন্দোলন আদতে এক গণআন্দোলন। সেখানে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ শামিল হয়। আন্দোলনের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা থাকে। সেই চাহিদাপূরণে এমন হওয়াটা নেতিবাচক কিছু নয়। যে ভালো অস্ত্র চালনা করতে পারে, ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা শত্রুর বুলেটকে প্রতিহত করা তার কাজ নয়। তার কাজ হলো স্বীয় জীবনকে বারুদের উত্তাপ আস্বাদন করানো। আর এটাই আল্লাহ তা'আলার অমোঘ নীতি।

যে এই রাস্তায় পা রাখবে তার লক্ষ্য হবে, দাওয়াহ ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। যারা তাগুতের দম্ভ চূর্ণ করে ইনসাফ ফিরিয়ে আনতে স্বীয় জীবনকে আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিবে। এই কণ্টকাকীর্ণ পথের পথিকের মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতেই পারে। তাই, সমালোচনা কিংবা অভিযোগ করার আগে থামুন এবং চিন্তা করুন। 'লোকজন আমাকে জটিলতায় ও কঠিন অবস্থায় ফেলেছে'—এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

আপনাকে কেউ কোনো কিছুতে জড়ায়নি। কেউই আপনাকে নিশ্চয়তা দেয় না যে, আন্দোলনের পথে আসার ফলে আপনাকে পদ-পদবী দেয়া হবে। আমরা আপনাকে একথাও বলি না যে, আপনার সাথে (সাহায্যের জন্য) মালাইকাগণ যুদ্ধ করবেন।

আমরা একথারও জামিনদার নয় যে, আসমান হতে ফেরেশতা এসে কাফির/মুমিন চিহ্নিত করে দিবে। আবার, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি হিসেবে থাকবেন এমন একজন, যার ওপর ওহী নাযিল হবে—এটাও কেউ বলে না।

এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। ইসলামি আন্দোলনের ময়দানে অতি-সংবেদনশীলতা বা মাত্রাতিরিক্ত আবেগের কোনো স্থান নেই। আমরা যা দেখি তাই বলি, আমরা শুধু তারই সাক্ষ্য দেই যা আমরা জানি। আর আমরা অদৃশ্যের সংবাদের সংরক্ষকই নই। যদি কল্পনার ভেলায় চড়ে চাঁদে অবতরণের স্বপ্ন দেখেন, স্বাভাবিকভাবেই আপনি ব্যর্থ হবেন।

অধিকাংশ মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার মসৃণ সড়কে চলতে ভালোবাসে। তারা চড়ুই পাখির ন্যায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বাসায় বসে খাওয়া-দাওয়া করে এবং সুমিষ্ট পানীয় পান করে। কাঁচঘেরা বাড়িতে বসে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। অথচ, এখন প্রতিরোধের সময়, বসে থাকার সময় নয়। যখন কেউ নীরবে সময় কাটায় তখন তারা উপদেশের ফুলঝুড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়। তারা স্বীয় জিহ্বাকে প্রসারিত করে বাকস্ফুরণ ঘটায়—"আমরা আশা করি..., আমরা সতর্ক করি..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ

"... যখন বিপদ কেটে যায় তখন তারা ধনসম্পদের লালসায় বাকচাতুরীতে লিপ্ত হয়।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:১৯)

পেছনে পড়ে থাকা নিষ্ক্রিয় লোকজনের অধিকাংশই খেলতামাশায় মত্ত। তারাই আবার জোর গলায় ময়দানের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে ক্ষমতালোভী হওয়ার অভিযোগ আরোপ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী আছেন যে, এই মহান নেতৃবর্গই রক্ত প্রবাহিত করছে এবং রক্তের মাঝে লুটোপুটি খাচ্ছে।

আন্দোলনের পথ তো এমনই। হয় তা ইনসাফ ফিরিয়ে দিবে কিংবা সংঘাতের তীব্রতা বাড়িয়ে দিবে। দাওয়াহ, জিহাদ সম্পর্কে আশাবাদী ও উদ্যমী হোন। নিজের মাঝে হিম্মতের সঞ্চার ঘটান। আত্মত্যাগীদেরকে আব্দুল্লাহ্ আজ্জাম, উমার আব্দুর রহমান, আনওয়ার শাবান, ইউসুফ আল উয়াইরী, তালাল কাসেমী, উসামা আবু আবদুল্লাহ, আইমান আবু মুহাম্মাদ বা আব্দুল্লাহ্ আহমাদরা আপনাদের থেকে বেশী দূরে নয়। তাদেরকে জানুন এবং ইচ্ছা, সংকল্প ও চেষ্টার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করুন। অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা আপনার জন্য যথেষ্ট। তাঁরা তো এই যমানারই সিংহপুরুষ।

আক্ষেপ, অভিযোগ আর সংবেদনশীলতার আশ্রয়ার্থী না হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যথাসম্ভব শামিল হওয়াই হবে সকল মুসলিমদের দায়িত্ব। কেননা, প্রত্যেকেই স্বীয় প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ অনুযায়ী আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করবে যথার্থ মূল্যায়ন।

وَ يُؤۡتِ كُلَّ ذِىۡ فَضۡلٍ فَضۡلَهٗ

"এবং প্রত্যেক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মুতাবিক দান করবেন।" (সূরা হুদ, ১১:০৩)